পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার

অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো জীবনবিস্তারী একজন লেখক যিনি বহুধা কর্মে এবং বিচিত্র সৃষ্টিতে নিজেকে প্রসারিত করেছেন, তিনি কেন ছড়া লেখার কথা ভাবলেন - এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই জেগে ওঠে পাঠকদের জিজ্ঞাসু মনে। তার অজুহাত একটা অবশ্য তিনি দিয়েছেন ছড়া সমগ্রর ভূমিকায় — ''যারা আমাকে খাইয়ে পড়িয়ে আয়েসে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের শ্রমের ঋন আমি শোধ করব কী উপায়ে? আমি তো চাষী বা কারিগর বা মজুর নই। এ ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ করা যায় না। সেইজন্য গান্ধীজী বলেছেন সূতো কেটে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে। কায়িক শ্রমে আমার মন নেই। জোর করে চরকা কেটেছি, ছেড়ে দিয়েছি। পিতৃঋণ ঋষিঋণ ইত্যাদির মতো এটাও একপ্রকার ঋণ। কাব্যে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে এ ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি। পারবও না। কোনো মতেই সে সব রচনা সহজবোধ্য হবে না। সহজবোধ্য করতে গেলে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। সেটা আমার নীতি নয়। তাহলে আমি কী করব? আমি ছড়া লিখব। কিন্তু লিখতে পারব কি? 'না না' করতে করতে একদিন লিখেই ফেলি ..... ''। ১

এভাবেই অন্নদাশঙ্করের এক ধরণের ঋণশোধ — যা সাধারণ মানুষের ঋণ, তাঁর দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ঋণ। রূপকথার সেই গল্পের মতো, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, বন্দিনী রাজকন্যার আবির্ভাব ঘটল অপার বিস্ময়ে। এই অপার বিস্ময় নিয়েই অন্নদাশঙ্কর হাজির হলেন ছড়ার রাজ্যে। শিল্পীর কাজ যেমন গর্ভিনী নারীর মতো যে কোন প্রকারে গর্ভ রক্ষা করা তেমনই শিল্পের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাও শিল্পীর কাজ। পরিবেশও পরিস্থিতিকে সচেতনভাবে শিল্পের পরিপোষকে পরিণত করতে হবে এই বোধ থেকেই একজন সদর্থক বাঙালী সাহিত্যিকরূপে অন্নদাশঙ্কর সচেষ্ট হয়েছেন।

শিল্পী অন্নদাশঙ্করের নিবিড় অর্থবহ জীবনের সমীক্ষা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আবেগগত এবং মননগত অন্বেষার দু-বাহু প্রসারিত করেছেন তাঁর ছড়াগুলিতে। একেবারে নির্দ্বন্ধভাবে সময়ের ছন্দকে তাঁর রচনায় তিনি ধরতে চেয়েছেন। মানবিক সক্রিয়তার বিকাশকে যথাযথভাবে বোঝাবার জন্য ছড়ার ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগিয়ে সত্যিকারের সাংস্কৃতিক মূল্য নির্দেশ করেছেন তাঁর রচনায়। অন্নদাশঙ্করের সৃষ্টি যেন তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায় স্ব-দেশ- বিদেশ এবং বিশ্বমানবের সত্যে অধিষ্ঠিত ও মননে সমৃদ্ধ তাঁর যথার্থ প্রেম। অমৃত-গরলে ভরা জীবন সমুদ্র মন্থন করে বিশ্বজননী জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার পৃথিবীকে দেখতে তিনি তৎপর হয়েছেন। তাঁর 'ছড়ার ভূমিকা' নিবন্ধটিতে সেই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন — ''জন সাধারণের কাছ থেকে আমি কত কিছু নিচ্ছি, অনেক কিছু পাচ্ছি, তার বদলে তাদের দিচ্ছি কি? কিছু না। ফলে তাদের উপযুক্ত করে কিছু দেওয়ার জন্য এক প্রকার জনসাহিত্যের মত আমি ছড়াকে নিলাম।'' ২ একজন সমাজমনস্ক লেখক তাঁর

সামাজিক দায় ও সামাজিক কর্তব্যের কথাই তুলে ধরলেন আমাদের সামনে।

তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' নামক ছড়ার বইতে যে মূলকথা তিনি বলতে চাইলেন তাঁর সারমর্ম এই — সাধারণের মানুষের ঋণশোধই তাঁর ছড়া লেখার প্রেরণা। এই অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীরে মর্মবাণী ব্যক্ত হতে দেখা যায় তাঁর ছড়ায়। ছোটদের জন্য লিখিত ছড়ার অধিকাংশ বই তিনি উৎসর্গ করেন আত্মীয়-অনাত্মীয় শিশুদের উদ্দেশ্যে। শিশুদের জন্য ছড়া বা শিশুদের প্রতি গভীর ভালোবাসাই কি তার একমাত্র কারণ? নাকি ছড়ার প্রতিটি তুচ্ছ কথার মধ্যে বাংলাদেশের একটি মূর্তিকে তিনি ধরতে চেয়েছেন, আস্বাদ রোপন করতে চেয়েছেন শিশুর মনে বাংলাদেশকে ভালোভাসাতে? নাকি তৈরি করতে চেয়েছেন ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসাবে? — এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই তাঁর ছড়াগুলির মধ্যে। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আগেই আমরা জেনে এসেছি অন্নদাশঙ্করের ছড়ার মূল উৎস লোকছড়া। লোকছড়ার ঐতিহ্যকেই অন্নদাশঙ্কর প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাঁর আধুনিক ভাবনায়। চির উপেক্ষিত লোকসাহিত্যের অন্তরালে রয়েছে ইতিহাস, সংরক্ষিত হয়েছে রূপকথা, যেখানে বয়সের গাছপাথর নেই, অথচ মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে তা নিত্য নবীন। নবীনত্বের দিকটি আরো পরিস্ফুট হয় অন্নদাশঙ্করের ছড়ায়। তাঁর ছড়ার নামগুলি খেয়াল করলে বা বইগুলির নামকরণের উৎস একটু যাচিয়ে দেখলেই দেখা যায় এগুলির উৎসও সেই লৌকিক ছড়ার মধ্যেই নিহিত আছে।

তাঁর ''উড়কি ধানের মুড়কি'র ভূমিকায় এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — ''রবীন্দ্রনাথ আমাকে ছড়া লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি চেষ্টা করিনি। যুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসু তাঁর ''এক পয়সার একটি, সিরিজের জন্য আমার কাছে ষোলটি কবিতা চান। তখন হটাৎ আমার হাত খুলে যায়। একদিন কি দুদিনের মধ্যে গোটা দশ বারো কবিতা বা ছড়া লেখা হয়ে যায়। 'উড়কি ধানের মুড়কি'-র প্রথম সংস্করণে ও ছড়া আর ছিল বিদেশী ধাঁচের পদ্য অনেকদিন আগে লেখা লিমেরিক ও ক্লেরিহিউ। পরবর্তী সংস্করণ লিমেরিকগুলি ছোটদের জন্য আলাদা করে রাখি। ওগুলি যায় ''রাঙা ধানের খৈ'' তে। 'উড়কি ধানের মুড়কি' যেমন বড়োদের ছড়ার বই 'রাঙা ধানের খৈ' তেমনি ছোটদের। আমার যাবতীয় ছড়া এই দুটি মাটির জালায় সঞ্চিত।'' ৩

১৯৫৩ সালে লিখিত এই ভূমিকাতে যে 'গূঢ় কথা' তিনি বলতে চেয়েছেন তা তাঁর জবানীতে সামাজিক মানুষ হিসেবে সাধারণ মানুষের ঋণশোধই ছড়া লেখার প্রেরণা। এই প্রেরণাই তাঁকে বাস্তবায়নের পথ বাতলে দেবার সুযোগ করে দেয়।

আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে ছড়ার প্রয়োগিক দিক বেশি লক্ষ্যনীয়। মানুষকে সচেতন করে তোলা ও তাঁদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ছড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, প্রবচন এই বিষয়গুলো অতি সহজেই মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়। তাই লোকসাহিত্যের এই মাধ্যমগুলো দিয়ে সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং সচেতন করা সম্ভব হয়। এ কারণেই হয়তো লোকছড়া থেকে তাঁর অর্থাৎ অন্নদাশঙ্করের ছড়ার বইয়ের নামগুলি গৃহীত হয়েছে।

অন্নদাশঙ্করের প্রথম ছড়ার বই 'উড়কি ধানের মুড়কি'র উৎস দুটি লোক ছড়া, একটি '' পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে'' ছড়ার শেষ পঙ্‌তি 'উড়কি ধানের মুড়কি' দেব শ্বাশুড়ি ভোলাতে।'' অন্যটি ''ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো,'' ছড়ার 'উড়কি ধানের মুড়কি দেবো নারেঙ্গা ধানের খই' পংক্তিটি থেকে। তাঁর আরো দুটি ছড়ার বই ''রাঙা ধানের খৈ' ও 'হৈ রে বাবুই হৈ' দুটি নামের উৎস একই লোকছড়া — '' হৈ রে বাবুই হৈ/রাঙা ধানের খৈ'' — নামক লৌকিক ছড়া থেকে গৃহীত।

''ডালিম গাছে মৌ' ও 'আতা গাছে তোতা' বই দুটির নামের উৎসও আমরা দেখতে পাই একটি লোকছড়া —

''আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ
কথা কব কী ছলে।
কথা কইতে গা জ্বলে।'' থেকে গৃহীত।

বহুল প্রচারিত একটি লোকছড়া — '' এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর'' — থেকে গৃহীত হয়েছে ''শালিধানের চিঁড়ে'' — ছড়াই বইটির নাম। উৎস পংক্তিটি এরকম — ''জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে ।'' এক সময়ের বাঙালী শিশুর দৈনন্দিনের ছড়া — ''দোল দোল দুলুনি / রাঙা মাথায় চিরুনী'' থেকে নেওয়া হয়েছে — অন্নদাশঙ্করের ''রাঙা মাথায় চিরুনি'' ছড়ার বইটির নাম। ''হট্টমালার দেশে''-র উৎসও আমরা দেখতে পাই ''খোকামনির বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে'' — লোকছড়াটি থেকে। বিখ্যাত লোকছড়া — ''খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে'' থেকে লেখক গ্রহণ করেছেন - ''ক্ষীর নদীর কূলে'' ছড়ার বইটির নামকরণ। এইসকল নামকরণ থেকেই বোঝা যায় লেখকের ছড়ার মূল ভিত্তিমূল কোথায়।

অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলি লোকছড়ার মতোই সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরাভরণ, ধ্বনিগুণসমৃদ্ধ ও চিত্রময়। লোকঐতিহ্য বহন করে তিনি তাঁর ছড়াগুলিতে স্থাপন করেছেন সমসাময়িক চিন্তাচেতনাকে। এই ছড়াগুলিই আজ বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের

কার্যকরী সম্পদে পরিণত হয়েছে। গণমানুষের বিশুদ্ধ বিনোদনের অভিব্যক্তিই শুধু এই ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশ হয়েছে সামাজিক জীবনের বিন্যাস, ঐতিহাসিক পটভূমি, অর্থনৈতিক ও দৈনন্দিন বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতির বহু ঘটনাবলী। দেশবাসীদের অন্তরমথিত বেদনা, মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণ, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, মোহ, জাতিগত শোষণ, পেষণ, নিপীড়ন বিভিন্ন ঘটনাবলী চিত্রিত হয়ে রয়েছে অন্নদাশঙ্করের ছড়ায়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় গান্ধীজী ভাইসরয় ওয়াভেলকে বলেছিলেন ইংরেজরা দুই বেড়ালের মধ্যে মুরুব্বি সেজে বানরের পিঠে ভাগ করার রাজনীতি করছে। এই মন্তব্য অবলম্বন করে অন্নদাশঙ্কর আধুনিক ভাবনায় বর্তমান পরিস্থিতিকে তুলে ধরলেন সংলাপমূলক অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি লিখলেন —

হুলো। বিচার করো হে দাস লছমনদাস।
তোমাকেই করি বিশ্বাস।
ভুলো। বিচার করো হে এসে লছমনদাস।
তোমা পরে রাখি আশ্বাস।

লছমনদাস। আচ্ছা রে আচ্ছা, বেড়ালের বাচ্চা
সুবিচার করব একদম সাচ্চা
ভুলো পাবেক আদ্ধেক হুলো পাবে আস্ত
বকশিশ পাবে কিছু লছমনদাস তো?

দুই বেড়াল ও এক বাঁদর (রাঙা ধানের খৈ)

লছমনদাস বিচারক সেজে পিঠে ভাগ করার পরামর্শ দেয়। যার পরিণতি ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করা। এই রাজনীতির চক্রান্তে আজও সকল দেশবাসীকে মাসুল দিতে হচ্ছে রক্তপাতের মূল্য দিয়ে। যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কোটি কোটি ভারতবাসীকে ভগ্নবুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে, অন্নদাশঙ্কর ছিলেন তাঁদের প্রথম সারিতে। এই দীর্ঘশ্বসাই তার ছড়ায় বাস্তবায়িত হয়ে সর্বজনের মন জয় করে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আছে।

এই ছড়াটির পরিপূরকরূপে চার বছর পরে আরেকটি ছড়া তিনি রচনা করলেন। ছড়াটিতে স্বাধীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে —

হুলোর হাতে ভুলোর কান
ভুলোর হাতে হুলোর কান
লছমনদাস ধরিয়ে দিয়ে
করল যেদিন লম্ফদান
সেদিন ওরা দুই বেড়ালে
নাচল তা ধিন্ তা ধিন্ রে
হাঁকল মুখে শিঙ্গা ফুঁকে
— আমরা এখন স্বাধীন রে।

পিঠে ভাগের পর (রাঙা ধানের খৈ)

অন্নদাশঙ্করের দৃষ্টি স্বচ্ছ সন্ধানী দৃষ্টি। সেখানে তিনি এমন ভাবে আলো ফেলেছেন যে, কোথাও কোনো অন্ধকারের লেশ মাত্র নেই। তাঁর রচনার পেছনে এমন একটি বিদগ্ধ জীবনকে অনুভব করা যায় তা যেমন উজ্জ্বল তেমন করুন। পিঠে ভাগের পর'' ছড়াটিতে এরকম একটি দৃষ্টান্তই লক্ষ্য করা যায়।

অন্নদাশঙ্করের ছোটোদের এবং বড়োদের উভয়ের জন্যই ছড়া রচনা করেছেন। বড়োদের ছড়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনাকে বেশি অবলম্বন করেছেন। ছোটোদের ছড়ায় এই অবতারণা তুলনামূলক কম ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উভয় ছড়াতেই এক কৌতুকময় সারল্য রয়েছে। সব কিছুতেই একটা মজা পাওয়ার ব্যাপার লক্ষ করা যায়, এমনকি উদ্‌বেগ ও ভয়েতেই মজা আবার উদ্‌বেগের সঙ্গে কখনো কখনো বেদনার সুর ফুটে ওঠে। যেমন —

একগাল তোর চুন, ও ভাই
আরেক গালে কালি
এমন করে কে সারালো
ডান গালী বাঁ গালী
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে
সংসার হাসালি। (বঙ্গদর্শন)

দেশবিভাগের একটা দিক অন্নদাশঙ্কর কখনোই মেনে নিতে পারেননি। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান একজাতি। তাদের দু-ভাগ করা অস্বাভাবিক প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ — এই বিশ্বাসে তিনি অচল ছিলেন। আসলে কায়িক বিচ্ছেদ মানা ছাড়া তার উপায় ছিল না, কিন্তু মানসিক বিচ্ছেদ মানতে উনি কখনো রাজি ছিলেন না। সেই মনোবেদনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপরিউক্ত ছড়াতে।

তাঁর এরকম অপর আরেকটি ছড়া —

অবাক হতো বিশ্ব যাদের
মেল দেখে
হদ্দ হলো নিত্য নতুন
খেল দেখে।
মাকে নিয়ে ভাগাভাগি
মড়ার মতন রে!
সে যদি বা সত্য হলো
এ কী আজব খেল।
ভায়ের মুকে হানলি সুখে দারুন শক্তিশেল। (ঘুঘু-চরানির)

শান্তি ও হিংসার মধ্যে সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অন্নদাশঙ্কর লিখলেন অভিনব মননসমৃদ্ধ ছড়া। সম্প্রদায়ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি কখনোই অন্নদাশঙ্করের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। স্বচ্ছ চিন্তার পাশাপাশি এই আবেগময় দেশপ্রেম তাঁর রচনার এক অমূল্য সম্পদ। স্বার্থভিত্তিক ভেদবুদ্ধি আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সেই বেদনা প্রকাশ পায় তাঁর এই ছড়াটিতে।

সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্রতর স্বার্থবোধ মানুষের মূল্যবোধকে কীভাবে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায় সেই দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই তাঁর ছড়ায়। দ্বিজাতীতত্ত্বের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য দিতে যখন দেশ ভাগ হয়, তখন কোটি কোটি ভারতবাসীকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় চোখের জলে। সেই ব্যথাবেদনা প্রকাশ পায় অন্নদাশঙ্করের ছড়ায়। তাঁর ছড়া তখন হয় ছেলে ভুলানোর পরিবর্তে বুড়ো চাবকানোর। সর্বজনের মন জয় করে বার বার ধ্বনিত হতে থাকে —

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা ? (খুকু ও খোকা)

'তারবেলা' এই অভিযোগটির পুনরাবৃত্তি ছোটদের অভিমানের ভাষাকে অবিকল তুলে আনে। খোকা যেন নিজের নিকটের কারো সম্পর্কে এরূপ সওয়াল করছে। তার এই ছড়াগুলির আত্মিক সম্পর্ক অতিশয় স্পষ্ট। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় —''বাংলাদেশের সনাতন ছড়া নতুন করে জেগে উঠেছে।'' এই নতুন ছড়ার উপাদান কিন্তু সনাতন বাংলা থেকে আহরিত নয়। আহরিত হয়েছে প্রত্যক্ষ জগৎ তথা সমকালীন বিশ্ব থেকে।

অন্নদাশঙ্করের এরূপ ছড়ার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। যেমন —

ওরে হনুমানের দল
যাসনে কেন লম্ফ দিয়ে যেখানে ইম্ফল?
যা, লড়াই করে যা
বলুক লোকে, সাবাস বটে মহাবীরের ছা।
আমার বাগান ধ্বংস করে তোদের কিম্ফল,
ওরে হনুমানের দল। (হনুমানের গান)

আলোচ্য ছড়াটিতে প্রথম স্ফুলিঙ্গ এসেছে জজের বাংলোর বাগানে হনুমানের দৌরাত্ম্য থেকে, তারপরেই তাদের বীরত্বের পরীক্ষা দিতে যেতে বলেছেন ইম্ফলে, যেখানে তখন জাপানের সমর্থনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আক্রমণের মুখে পিছু হটেছে ব্রিটিশ বাহিনী। আবার 'ইম্ফলের' সঙ্গে 'কিম্ফলের' মিলটা ভীষণভাবে লক্ষণীয় যা জাত ছড়ার মিলের মতো।

অন্নদাশঙ্করের অপর আরেকটি বিখ্যাত ছড়া 'কাঁদুনি' ১৯৪৫ সাল লেখা ছড়াটি —

জাপানীরা ভাগল কেন
খবরটা কি রাখেন?
কেশনগরের মশার মামা
ইন্‌ফ্লেতে থাকেন।
পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হটৎ।
মশা।
তুচ্ছ মশা!
মশার জ্বালায় সেদিন হতো
ডানকার্কের দশা!
মশায়
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।

অন্নদাশঙ্করের জীবনের আপাত তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে ছড়াটি রচিত হলেও অন্তর্নিহিত একটি গভীর অর্থও এর মধ্যে রয়েছে। ছড়াটির প্রাথমিক উপলক্ষ কৃষ্ণনগরে বার বার ম্যালেরিয়ার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বদলি নিয়ে বীরভুমের সদর শহর সিউরিতে চলে আসা, এই বিষয় উপলক্ষ করে ছড়াটিতে জনযুদ্ধ, পলাশির যুদ্ধ, ডানকার্কের পতন প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখে ছড়াটি অপূর্ব সমৃদ্ধ ছড়ার জন্ম দিয়েছে। ওইসব উল্লেখের তাৎপর্য যদি কেউ বোঝে তো খুব ভালো, না বুঝলেও ছড়ার মধ্যে মজা ঠিকই পাওয়া যায়। মজার রসে পরিপূর্ণ ছড়াটিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর প্রথমত সাহিত্যিক তথা শিল্পী। তাঁর প্রথম দায়িত্ব নিজের প্রতিভার প্রতি, আর প্রধান কর্তব্য সাহিত্যিক সৃজন। এ বিষয়ে তিনি অতি সচেতন ছিলেন তবে কেন তিনি সময় এবং শ্রম রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যয় করলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন — ব্যক্তি মানুষ প্রথমে মানুষ তারপর আর যা কিছু। যে মানবধর্ম আর সব ধর্মকে ছাড়িয়ে মঙ্গলের পথে আমাদের নিয়ে চলেছে তার রাজনৈতিক প্রকাশ গণতন্ত্র। বহুজাতিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ ধর্মনিরপেক্ষতা। সে নীতি আজ আক্রান্ত, বিপন্ন, এখানে মানুষ হিসেবে শিল্পীর সাহিত্যিকের প্রথম কাজ রাজনীতির কালিতে কলম চুবিয়ে জনশিক্ষার কর্তব্য পালন

— অনন্তকাল না হোক, কিন্তু সমস্যার মোকাবিলা করা যতদিন নিতান্ত প্রয়োজন ততদিন। এরকম একটি পরিস্থিতি — এত এটলি যখন ভারতের স্বাধীনতার পূর্বশর্তরূপে চাইলেন অন্তবর্তী সরকার ও সংবিধান প্রণয়কারী সভাগঠন, ১৯৪৫ সালের ২৫ শে জুন তখন সিমলায় বসল দেশের সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনা সভা। ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সব সদস্য ভারতীয় হবেন এই প্রস্তাব সন্তাষজনক হলেও তাতে '' Equal proportions of caste Hindu and Moslems '' — এর প্রশ্নে অশান্তি দেখা দিল। জিন্নার অনমনীয় মনোভাব ও তাঁর প্রতি ব্রিটিশ সমর্থন যখন সম্মেলনের সাফল্যকে অনিশ্চিত করে তুলেছে তখন জিন্না জেদ ধরলেন যে মুসলিম লীগ মনোনীত নয় এমন কোন মুসলমান উল্লিখিত কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন না। এর অর্থ কংগ্রেস মনোনীত কোন মুসলমান, যেমন আবুল কালাম আজাদ অথবা আসফ আলি, ওই কাউন্সিলের সদস্য হবার পক্ষে অনুপযুক্ত। অন্নদাশঙ্কর এই কূট পরিস্থিতির উপর লিখলেন —

এতদিন যে নাচিতেছিলেম
তাক ধিনা ধিন ধিন্না
বাড়া ভাতে ছাই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।
বনে যাবেন শ্রীদশরথ
রাজা হবেন রামজী।
কৈকেয়ী সে কোথায় ছিল
দিল এসে ভাঙ্‌চি।
দশরথ তো রয়েই গেলেন
সোনার সিংহাসনে
শ্রীরামকে যেতে হলো
দন্ডক কাননে।
শোন রে ও ভাই রাশিয়ান রে
শোন রে ও ভাই চীন্না
পাকা ধানে মই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।

রাম রাজ্যবাদীর বিলাপ
(উড়কি ধানের মুড়কি)

স্বাধীন শিল্পীর মতো সত্যের দায় থেকেই অন্নদাশঙ্কর লিখলেন এই ছড়াটি। ছড়ার মধ্য দিয়ে চমৎকার একটি ঘটনাকে তুলে ধরলেন অভিনব ভাবনায়। যেখানে প্রকাশ পায় কৈকেয়ীর মতো চরিত্রের, প্রকাশ পায় 'বাড়া ভাতে ছাই', 'পাকা ধানে মই', প্রভৃতি প্রবাদ। লৌকিক ছড়ার আদলে এই ছড়াটিতে রয়েছে সমাজের সর্বনাশা পরিণাম। যা স্বাদে আলাদা।

একই সময়ে অন্নদাশঙ্কর সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে অনেকগুলি অসাধারণ ছড়া লিখলেন। যেমন এটালির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ফলে ভারতের রাজনীতিতে নতুন সম্ভাবনার উদয় দেখে লিখলেন, 'কোথায় চায়ের কেটলি রে/ মন্ত্রী হলেন এটালি রে', জাপানের উপর পরমানু বোমা প্রয়োগের অমানুষিকতা নিয়ে লিখলেন, 'মুখপোড়াটা হনুমান লঙ্কা পোড়ালি/লঙ্কাপোড়া আগুন দিয়ে মুখও পোড়ালি;' সাম্যবাদী শ্রেণীদ্বন্দের তত্ত্বের অন্তর্গত পরস্পর বিরোধীতার উপর মন্তব্য করলেন,

'চটি ফটফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী
সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত
ঘোষ বোস আর বানরজী। সাত ভাই চম্পা
(উড়কি ধানের মুড়কি)

শিল্পীর স্বাধীনতার দায় থেকেই আসে ন্যায় ও সত্যের দায়। সেই দায় অন্নদাশঙ্কর কীভাবে বহন করেছেন তা আমাদের কাছে তুলে ধরলেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে। তিনি লিখলেন —

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান। বঙ্গবন্ধু
(শালি ধানের চিঁড়ে)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গকে যেরকম নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসেই এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। তখন অন্নদাশঙ্কর চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এরকম একটি ছড়া রচনা করলেন। এভাবেই অন্নদাশঙ্কর নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তার অভ্যন্তরে নিহিত গূঢ়তর স্বরূপের অন্বেষণ করেছেন। অন্নদাশঙ্কর কোনও ক্ষেত্রেই কোনও সময়েই প্রথাসিদ্ধ ধারার অনুবর্তন করেনি, তাঁর শিল্প সত্যের সন্ধানে দুঃসাহসী অভিযান। এইঅভিযান এসেছে তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ থেকে। তাই একজন সাহসী ও স্বাধীন শিল্পীর দায়িত্বে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পৌরাণিক বিষয়ের অন্তরালে আধুনিক ভাবনাকে কীভাবে তুলে আনা যায় তা আমরা দেখতে পাই অন্নদাশঙ্করের ছড়াতে। নারীর সম্মান রক্ষার্থে পৌরাণিক কাহিনীকে সামনে রেখে ছড়ার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আধুনিক ঘটনাকে তুলে ধরলেন তাঁর ছড়ায়। আসলে আধুনিক অন্নদাশঙ্কর ভারতবর্ষকে আধুনিক, সেকুলার, বৈচিত্র্যের বহুতন্ত্রী বীণা হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। আসল শক্তি ও সৌন্দর্য্যের জায়গাটি তিনি সনাক্ত করতে চেয়ে লিখেছেন —

নারীর অপমান সয়না ভগবান
সীতাই রাবণের ধ্বংস।
দ্রৌপদীরই তরে কৌরবেরা মরে
হস্তিনাপুর নির্বংশ।
বঙ্গে খান্ সেনা নারীকে ছাড়বে না
হাজার হাজার তার সাক্ষ্য
ভারতে রাণীসম তাঁকেও নির্মম
এহিয়া বলে কটুবাক্য।
তাই তো হল তার রণে দারুন হার
দম্ভ হলো তুচ্ছ
পশুরা ধরা পড়ে এহিয়া যায় সরে
ইন্দিরা হল আরো উচ্চ। ইন্দিরার সম্মান
(শালি ধানের চিঁড়ে)

সাহিত্যের সবধরণের সৃজনশীল ভাবনাধারা, নতুনত্ব এবং সৌন্দর্য সবথেকে বড় স্রোতই হল সমাজের বিস্তৃত জনজীবন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর কোনো বিকল্প নেই। যিনি জীবনকে যতটা জানেন, পরম্পরা থেকে শুরু করে তার নিত্য নতুন বিবিধতার স্তরে যতটা বেশি প্রবেশ করতে পারবেন তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ততটাই শক্তভুমিতে নিজের স্থান করে নিতে পারেন। জীবন যদি রচনাশীলতার অসংখ্যধারার অক্ষয় স্রোত বলে গণ্য হয় তাহলে অন্নদাশঙ্করের ছড়া তার সবথেকে জীবন্ত উদাহরণ। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভান্ডার এত গভীর তা বোঝা যায় তাঁর ছড়াগুলো থেকে। যেমন —

শুনহ ভোটার ভাই
সবার উপরে আমিই সত্য
আমার উপরে নাই।
আমাকেই যদি ভোট দাও আর
আমি যদি হই রাজা
তোমার ভাগ্যে নিত্য ভোগ্য
মৎস্য মাংস খাজা। শুনহ ভোটার ভাই
(শালি ধানের চিঁড়ে)

রাজনীতি চলমান জীবনের প্রকাশরূপ, তার নিজস্ব রূপ ও রঙে কালে কালে রকমফের ঘটে চলেছে। বিগত একশ বছরে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম, স্বাধীনতা লাভের হাত ধরে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতির হালচাল অনেক বদলেছে। স্মৃতির সূত্র ধরে হয়তো একালে বসে সেকালের রাজনীতির ছবি আঁকা যায় মনে মনে, কিন্তু তুলনা করতে যাওয়া বৃথা। ছড়া হয়তো আমাদের প্রায় পঁচাত্তর আশি বছরের রাজনীতির রূপ বদলের চিত্রশালাটি তুলে ধরতে পারে, কিন্তু রাজনীতির একাল- সেকালের তুল্যমূল্য বিচারে ধরা দেয়না, কারণ সাহিত্যের এই বিশেষ প্রকারের মাধ্যমটি বাঁকাহাসি হাসতে ভালোবাসে, চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম হয় আমাদের। এই শাণিত চিত্রায়ণই অন্নদাশঙ্কর ছড়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন।

এই ছড়াটির পরিপূরক রূপে আরেকটি ছড়া —

আসবে কবে নভেম্বর এই বেলা তুই ঘর ছেয়ে নে
নভেম্বরে না ডিসেম্বর ? ছেয়ে নে তোর আপন ঘর।
আবার কবে নির্বাচন স্বয়ংবরে জয় না হলে
নির্বাচন না স্বয়ংবর? থাকবে না তোর এই কদর স্বয়ংবর (শালি ধানের চিঁড়ে)

যদি একবার রাজনীতির দরজা খোলা যায় তাহলে আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার রাস্তা পাকা হয়ে যায় নেতাদের। লাল-নীল-কালো বিভিন্ন টাকায় সিন্দুকে বান ডেকে যায়। সেই সাফল্যের সিঁড়িতে একবার উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কোনো চিন্তাই নেই, কিন্তু উত্তীর্ণ না হলে কদর থাকে না। এই চিত্রটিই এঁকেছেন অন্নদাশঙ্কর তাঁর ছড়ায়।

ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতি চিরকাল ভারতীয়দের উপহার নিয়ে চলেছে শালপাতর বদলে রাংতায় মোড়া ফ্যাসিবাদ, রূপেমাত্র ভিন্ন অরূপে এক। ছড়া সেই অরূপের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্ষতস্থানটি সযত্নে চিহ্নিত করে তোলে। অন্নদাশঙ্করের এরকম একটি ছড়া —

জোর যার মুলুক তার ভোট যার গদী তার
মুলুক যার ভোট তার গদী যার ভোট তার
এই কথাটি জেনো সার
বুলেট যার ব্যালট তার বুলেট যার ব্যালট তার
(শালি ধানের চিঁড়ে)

নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য বাহুবল প্রয়োগ করে দুর্নীতিতে মত্ত হয়ে ওঠর চিত্রটি এখানে তুলে ধরেছেন। আসলে সব লেখকই তাঁর চেনাজানা জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে বাস্তবকেই বেশি গুরুত্ব দেন। অন্নদাশঙ্কর ও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। তাঁর সৃষ্টি ছড়াগুলোই তার বড়ো প্রমাণ।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ফোকলোর নানাভাবে সম্পৃক্ত। সেই ফোকলোরের একটি শাখা ছড়া। ছড়াতে নান্দনিকতা, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবলীলায় প্রকাশ পায়। প্রায়োগিকতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় মানবজীবনের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়েই ছড়া রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খেলাধূলাও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। লৌকিক ছড়ার মতো সাহিত্যিক ছড়াতেও অন্নদাশঙ্কর খেলার বিষয়টিকে এড়িয়ে যাননি। বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে লৌকিক ছড়ার ধাঁচে তিনি রচনা করলেন —

উলু মাদারের ফুল
বর এসেছে কতদূর?
বর নয় গো বিশ্বকাপ
দ্বিগ্বিজয়ের শেষের ধাপ
দুমদাম ধুমধাম
ভারত করেছে নাম।
উলু উলু মাদারের ফুল
বিয়ের মতো হুলুস্থুল। বিশ্বকাপ (বিন্নিধানের খই)

ছড়াটি লোকছড়া — ''উলু উলু মাদারের ফুল''-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। সর্বজনীন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ছড়াটিতে। বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যেমন হুলুস্থুলু দেখা যায়, বিশ্বকাপ জেতার আনন্দেও তেমনি হুলুস্থুলু চোখে পড়ে সকল দেশবাসীর মনে। তা প্রকাশ পেয়েছে ছড়াতে —

তাই এত উল্লাস
বোমা ফাটে চারপাশ
মাঝরাতে রাস্তায়
কেউ নাচে কেউ গায়।

এই ছড়াটিতে হৃদয়ভুমির মূল্য অনেক বেশি, মস্তিষ্কচর্চা অপেক্ষাকৃত কম। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে উভয়দিকেই একটা অনায়াস ভঙ্গি রয়ে গেছে। লোকছড়ার মতো সহজ সরল স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি যা সকলের কাছেই গ্রহনযোগ্য। তাই পুরাতন ঐতিহ্যকে বহন করলেও বর্তমানেও এক চিরন্তনত্বের প্রকাশ পায়।

ছড়াকে একসময় উদ্দেশ্যহীন বিষয় হিসাবে গণ্য করা হত। বলা হত এ যেন শিশুর অস্পষ্ট মনোজগতের অর্থহীন ছন্দছটা। কিন্তু কলোর স্রোতে ছড়ার অর্থহীন ছন্দছটা অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পড়েছে। জন্ম দিচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের। অতএব, বোঝা যায়, সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলোও অর্থবোধে কালোপযোগী বিবর্তন হয়ে এক যুগোপযোগী পরিবর্তন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের এরকম একটি ছড়া —

খরা! খরা! খরা!
খরার জ্বালায় জ্বলছে দেশ
বর্ষার মেঘ নিরুদ্দেশ
শুকিয়ে গেল ধরা।

স্মরণ রেখো তুমি
অরণ্যের মৃত্যু যেথা
সাহারা গোবির জন্ম সেথা
ধূ ধূ মরুভূমি।

কেন ! কেন ! কেন ! সুন্দরবন যদি
বনস্পতি হলে নিপাত ক্রমে ক্রমে হয় উজাড়
হয় না দেশে বৃষ্টিপাত বাড়বে মরূভূমির বাড়
খরাই হয়, জেনো। কলকাতা অবধি।

খরা (বিন্নি ধানের খই)

ধ্বংসের হাত থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা না করলে তার প্রভাব কিরূপ হবে — এই সাবধান বাণীই তুলে ধরা হয়েছে ছড়ার মাধ্যমে। ছড়া জাতীয় স্বার্থে উদ্দেশ্যসম্পন্নকারী একটি বিষয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জনজীবনের সঙ্গে ছড়ারও একটি প্রায়োগিক দিক রয়েছে। অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় সেই দিকটিও প্রকাশিত।

এভাবেই অন্দাশঙ্কর রায়ের ছড়াকার রূপে বাংলার আকাশে আগমন। যাঁর মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যের একটি অনাদৃত বিভাগ অপ্রত্যাশিতভাবে অসামান্য সন্মানের আসন অধিকার করে। ছড়াগুলি স্বতোভাস্মর হয়ে ওঠে স্বকীয়তায়। এই স্বকীয়তা আসলে একজন মনস্বিতার প্রকাশ, যা শুধুমাত্র আলোকস্তম্ভ হয়েই থেমে থাকে না, আগামী প্রজন্মকেও জোগাবে প্রেরণা প্রবর্তিত করবে গতিশক্তিকে। এভাবেই একজন সমাজমনস্ক লেখক 'ঋণশোধ' করে চলেছেন সমাজের।

(১) রায় শিবনারায়ন ঃ বিবেক শিল্পী অন্নদাশঙ্কর, ডি .এম. লাইব্রেরি, ১৯৮৫ কলকাতা-৬, পৃঃ ৬৩

(২) রায় শিবনারায়ন ঃ বিবেক শিল্পী অন্নদাশঙ্কর, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৮৫ কলকাতা - ৬, পৃঃ ৭২

(৩) রায় শিবনারায়ন ঃ বিবেক শিল্পী অন্নদাশঙ্কর, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৮৫ কলকাতা - ৬, পৃঃ ৭২